দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

048

৬১

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিদেশী সাহায্যের হাল

দাতাদেশগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডকে পাঠ্যপুস্তকের জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছে। ইউনেস্কোর মাধ্যমে সাহায্যদাতা দেশগুলো ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার দিতে প্রতিশ্রুত। এর মধ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে পাওয়া যাবে ৯৭ লাখ ডলার। এই অর্থে ১৯৮৪-৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যয়নির্বাহ করার কথা।

দাতাদেশগুলোর অনিচ্ছার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু ত্রুটি রয়েছে। আর দ্বিতীয় অভিযোগটি গুরুতর। তাহল দাতা সংস্থা থেকে প্রদত্ত কাগজের পরিবর্তে নিকৃষ্টমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়। অপরদিকে বিশ্বব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদের অভিমত মুদ্রণ ব্যবস্থাটা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের হাতে সবটা না রেখে বেসরকারীভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করলে উপযুক্ত মানের বই প্রকাশ সম্ভবপর হবে।

শিক্ষকরা মনে করেন যে, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড নির্ধারণ না করে বেসরকারীভাবে শিক্ষকদের হাতে তা নির্ধারণের ভার দেওয়া উচিত।

একদিকে বই-এর গুণগত মান উন্নয়নের প্রশ্ন এবং অপরদিকে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের কাগজের মান নিয়ে কথা উঠেছে। দ্বিতীয়টি দাতা সংস্থা তুলেছে। তারা প্রতিবছর পাঠ্যসূচী বদলানোর ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছেন।

প্রতিবছর নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপতে অর্থ ব্যয় বেড়ে যায়। কারণ পরিবর্তিত কিছু পাঠ্যবস্তু বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা যে নতুন করে ছাপার জন্য করা হয় তা বলা বাহুল্য। এটা শুধু অর্থের অপচয় নয়, কিছুটা স্বার্থবুদ্ধিও এর পেছনে থাকতে পারে। ১৯৮৭ সালে মুদ্রিত ৭ম শ্রেণীর গণিত এবং ১৯৮৯ সালে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে অঙ্কের উত্তরটি উত্তরমালায় আগেরটি রয়ে গেছে। প্রশ্ন একই ধরনের। একই নিয়মে তা করতে হবে। তাহলে এই পরিবর্তনের দরকারটা কি? এভাবে অর্থের অপচয়ের সঙ্গে দুর্নীতির কোন সম্পর্ক নেই একথা হলফ করে বলা কঠিন।

আর নিকৃষ্টমানের কাগজ যে দেওয়া হচ্ছে তা বই হাতে নিলেই দেখা যায়। এজন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং কাগজ সংক্রান্ত অভিযোগটি গুরুতর এবং আমাদের পক্ষে তা লজ্জাজনক।

দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার হাত তো আছে। গণিত পুস্তক প্রথম বাংলায় রচনা করে, তারপর ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়। কারণ টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে কিছু বিদেশী শিক্ষা উপদেষ্টা থাকেন। তারা দেখে দেওয়ার পর পুনরায় তা বাংলায় করা হয়। বই দেখাশোনার ব্যাপারের কারণে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিমূর্ত গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় তবে শিক্ষাক্রমের অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নটি অধিকতর বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত। সেখানে আমাদের দেশের শিক্ষকদের অভিমত নয়, বিদেশী উপদেষ্টার নির্দেশই কার্যকর হয়।

সুতরাং একদিকে আমাদের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ রয়েছে, অন্যদিকে আমাদের ওপর নির্দেশ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। অভিযোগ যেক্ষেত্রে সত্য তা জাতীয় মর্যাদাহানিকর আর নির্দেশ পালন জাতীয় অগৌরব হয়ে আমাদের ব্যথিত করে।

দাতা সংস্থাগুলোর আর একটি যুক্তি রয়েছে তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভা-বনার পিছনে। আমাদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তারা অনির্দিষ্টকাল ধরে এটা বহন করতে পারে না। একটা পর্যায়ে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াই এটাই নাকি তাদের কাম্য। অথচ সে লক্ষণ আমাদের আচার-আচরণে ও কর্মে লক্ষ্য করা যায় না।

বছর বছর পাঠ্যসূচী বদলানোর ক্ষেত্রে কী নীতি কাজ করে তা কেউ জানে না। এবং দুটি বইয়ের মধ্যে নতুন একটি প্রবন্ধ, গল্প কিংবা ওই ধরনের কিছু স্থান পায়। তার সঙ্গে শিক্ষানীতি, দেশের সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোন নতুন ধারা কিংবা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই।

এছাড়াও দেখা যায় প্রচলিত অর্থে লেখক নয় কিন্তু বিশেষ অবস্থানের জন্য তাদের লেখা পাঠক্রমে স্থান পায়। লেখক হিসাবে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত বা সুপরিচিত নয় এমন আমলা লেখকদের লেখা পাঠ্যসূচীতে লক্ষ্য করা যায়। এটা কি খুব প্রয়োজনীয়? কিন্তু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এ ধরনের প্রশ্ন তুলতে পারেন না। কারণ উপর মহলের বিরাগভাজন হলে তাদের প্রতিষ্ঠান আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

দাতা সংস্থার নিকট আমরা কিছুটা দায়বদ্ধ থাকব এটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাদের নির্দেশাদির বাইরে যেখানে আমাদের সম্পর্কে তারা কিছু অভিযোগ তোলেন সেখানে সবটা অসত্য নয় বলে, তাদের নিকট আমরা আরও অধিকতর শক্ত বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। এটা না গৌরবের, না বাঞ্ছনীয়।

আর সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে যে অপচয়ের কথাটা আগে তোলা হল তার যুক্তিটাও প্রাসঙ্গিক। অহেতুক ব্যয় বৃদ্ধির কার্যক্রম অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে, আর চিরকাল তারা আমাদের শিক্ষার একটা ব্যয় বহন করবে, এরকম মানসিকতা নিজেদের কার্যক্ষমতাকে খর্ব করে কাজের স্বাধীনতাকেও সংকুচিত করে।

পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অবশ্যই এখানে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত পুস্তক ভাবের দিক উচ্চ নয়, রচনার দিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থানীয় নয় এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে অবহেলা ও দ্রুততার ছাপ স্পষ্ট। এনিয়ে পত্র-পত্রিকায় বার বার কথা উঠেছে। কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্যাটি উপলব্ধির চেষ্টা করেননি, সবটাই তারা নিন্দা ভাষণ হিসাবে ধরে নিয়েছেন, হিতৈষীর পরামর্শ বলে গ্রহণ করার মত উদারতা দেখাতে পারেননি।

দাতা সংস্থাদের ভূমিকাও দেশবাসী জানে না। শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে খবরদারিটা দেশের অভিভাবকের না বিদেশী উপযাচকের এটা ঠিকমত তারা বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলে বাজারে হাজার কথা রটে। গুজব আর সত্যের জট পাকিয়ে অবস্থাটা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেটা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সহায়ক হয়নি।

তাই এটা জানা প্রয়োজন যে, দাতা সংস্থাগুলোর সাহায্য বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনার পিছনে যে বিষয়গুলো কাজ করেছে, সেখানে আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া কী। এটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের তুলে ধরা উচিত দেশবাসীর সামনে।